গান্ধী'স লেগাসি

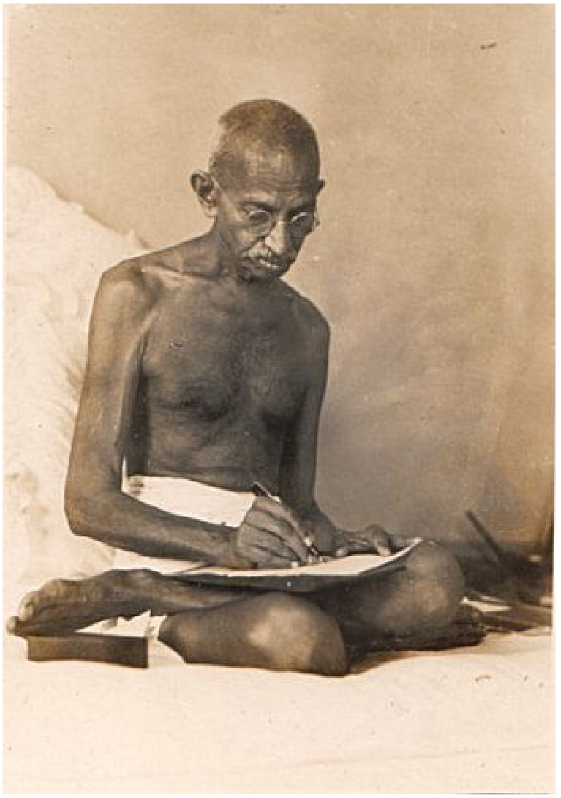

মূল : ভিখু পারেখ

অনুবাদ : আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

প্রকাশক

শাহাদাত হোসেন

অন্বেষা, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০০৯

প্রচ্ছদ

'Gandhi at Correspondence'

V.N. O'key

Mahatma Gandhi Album : A Day with Gandhi

© গ্রন্থস্বত্ব

অনুবাদক

ISBN

মূল্য :

Gandhi's Legacy, by Bhikhu Parekh, Gandhi Foundation, London, translated by Anwarullah Bhuiyan, Published by Annesha, Banglabazar, Dhaka 1100, First published June 2009.

অনুবাদকের উৎসর্গ

শাহীন চৌধুরী ওয়েষ্টকম্ব
বেবি মওদুদ

পূর্ব-কথন

গান্ধীর রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক অভিজ্ঞান নিয়ে ইতোমধ্যে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে সমকালীন বিশ্বে জাতিগত সংঘাত ও ধর্মীয় উগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি ও আন্তপ্রীতির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই বিবেচনায় গান্ধীর অহিংসনীতি একটি সংগতিপূর্ণ কৌশল হিসাবে আলোচিত হচ্ছে।

পরিবেশ দর্শন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গান্ধী সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ জন্ম নেয়। পরিবেশ দর্শনের বহুমাত্রিক তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে 'গভীর প্রতিবেশবাদ' সবিশেষ উল্লেখ্য। নরওয়ের দার্শনিক আর্নি নায়েস পরিবেশ সংকট নিরসনে পরিবেশ-আধ্যাত্মবাদের প্রস্তাব করেন। এর উপর ভিত্তি করেই গভীর প্রতিবেশবাদের বিকাশ। নায়েস দার্শনিক চিন্তার খোড়াক কোথা থেকে পেয়েছেন সে সম্পর্ক তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় একাধিকবার স্বীকার করেছেন। সেই স্বীকারোক্তিতে তিনি অকপটে গান্ধীর 'অহিংস দর্শন' এবং 'সত্যাগ্রহের' কথা বলেন। আবার ই.এফ. সুমেকার তাঁর *Small is Beautifull* গ্রন্থেও বৌদ্ধদর্শন ছাড়া গান্ধীর দার্শনিক চিন্তার প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির ক্ষেত্রে উপযোগবাদ এবং মার্কসবাদী অর্থনৈতিক ধারার বিকল্প একটি পরিবেশস্মত অর্থনৈতিক নীতির প্রস্তাব করেন। সেখানে সুমেকার একটি আদর্শ অর্থনেতিক মডেলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও গান্ধীর অহিংস নীতির কাছে ফিরে গিয়েছেন।

গান্ধীর দার্শনিক অভিজ্ঞানের অনুশীলন শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি পরিবেশ নিয়েও ভেবেছেন। এই ভাবনার প্রতিফলন হিসাবে তিনি চিপকোতে অবাধে বন-উজাড় বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এই লড়াইয়ে চিপকো'র স্থানীয় অধিবাসী ও লোকায়ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর উদ্ধুকরণের মধ্য দিয়ে সেখানে পরিবেশ ও নারীর অধিকার আদায়ের লড়াই শুরু হয়। চিপকোর পরিবেশ ও নারীর অধিকার আদায়ের দার্শনিকীকরণের আঙ্গিক বিবেচনা করে পাশ্চাত্যের একাডেমিক জগতে প্রতিবেশ-নারীবাদ বা ইকোফ্যামিনিজম অভিধায় একটি জ্ঞান-ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রাসোয়াস দো'বন, ভল পামউড, ক্যারেল মার্চেন্ট. ক্যারেন ওয়ারেন সহ আরো অনেকে এই জ্ঞান শাখায় কাজ করছেন।

একজন সামাজ সংস্কারক বা রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক আছে, মতদ্বৈততা রয়েছে। কিন্তু তাঁর চিন্তার যে আধিবিদ্যক এবং নৈতিক ধারাটি রয়েছে এর প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। একজন প্রভাব

বিস্তারকারী দার্শনিক হিসাবে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা এখনও ফুরিয়ে যায় নি। সেই প্রয়োজন থেকে সমকালীন জ্ঞান চর্চায় গান্ধী খুবই প্রাসঙ্গিক।

ভিখু পারেখের *গান্ধী'স লেগাসি* ছোট পুস্তিকাটি শাহীন চৌধুরী ওয়েষ্টকম্ব-এর সৌজন্যে পেয়েছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর নারী অধ্যায়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে শাহীন আপা অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। তিনি আগ্রহ নিয়ে এই বক্তৃতাটি পড়তে দিয়েছিলেন। বক্তৃতাটি পাঠ করে বুঝেছি গান্ধীর দর্শন ও অনুধ্যানকে বোঝার জন্য এটি উপযোগীও। সেখান থেকে এটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই। অনুবাদটি বহুল প্রচারের জন্য মুদ্রণ দরকার, আর এর মুদ্রণের অনুমতি নিয়ে দিয়েছেন শাহীন চৌধুরী ওয়েস্টকম্ব। অধ্যাপক ভিখু পারেখ, শাহীন আপা, এবং গান্ধী ফাউন্ডেশন সবাই এই কর্মের কৃতিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ছোট এই বক্তৃতাটির দার্শনিক তাৎপর্য অনেক গভীর এবং বৃহৎ। প্রাথমিক পাঠে ইংরেজি বক্তৃতা বোঝা যায় সহজেই। কিন্তু যখনই হাতে-কলমে অনুবাদের কাজে বসলাম তখন ঠাহর করেছি কষ্টটা কোথায়। সেকারণে শেষতক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ করেছি। কোনো একটি ভাষাকে অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরের জটিলতা এড়ানোর জন্যই এই কৌশল গ্রহণ করেছি। মুল বক্তব্য, ভাব এবং দার্শনিক মৌলিকত্বের দিকটি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অধ্যাপক ভিখু পারেখের বক্তব্যটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। বাংলাভাষাভাষি সকলের নিকট গান্ধী সম্পর্কে একজন তাত্ত্বিকের মূল্যায়ন পরিবেশন করাই আমার এই কাজের মুল লক্ষ্য। বক্তৃতাটি বাংলায় পরিবেশনের জন্য শাহীন চৌধুরী ওয়েষ্টকম্বের কৃতিত্বই বেশি। যা কিছু সীমাবদ্ধতা তা আমার।

জুন ২০০৯

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ভিখু পারেখ

ভিখু পারেখ বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তারপর লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একসময় এলএসই এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। বর্তমানে তিনি হাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কনকরডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাকগিল বিশ্বদ্যিালয়ে অতিথি অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার বিভাগের অতিথি অধ্যাপক। ভারতের বিখ্যাত বরোদাা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

অধ্যাপক ভিখু বেশ কিছু গ্রন্থের প্রণেতা। বিশেষ করে *Hannah Arendt and the Search for a New Political Philsophy* (1981), *Marx's Theory ofn Ideology* (1982), *Contempoarary Political Thinkers* (1982), *Gandhi's Political Philsophy* (1989) এবং *Colonialism, Tradition and Reform* (1989)। তিনি প্রায় এক ডজন বই সম্পাদনা করেছেন। বিশেষ করে চার খণ্ডে প্রকাশিত *Critical Assesment of Jeremy Bentham* সম্পাদনাটি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গবেষণা জার্ণাল এবং সম্পাদিত গ্রন্থে তাঁর প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর *Rethinking Multiculturalism* গ্রন্থটিও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ একাডেমিক হিসাবে বৃটেনের পাবলিক জীবনে তিনিও সক্রিয়। তিনি কমিশন ফর ইকোয়্যালিটির ডিপুটি চেয়ারম্যান, পরে একবছরের জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন। তাছাড়াও Runnymede Trust, The Institute of Public Policy Research, The Anne Frank Educational Trust এর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। একাধারে 'কাউন্সিল ফর ওভারসিস স্টুডেন্ট এফায়ার্স' এবং 'গান্ধী ফাউন্ডেশনের' সহ-সভাপতি। ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক পারেখ ব্রিটিশ এশিয়ান হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি বৃটেনে Debrett's Men of Eminence হিসাবে সর্বধিক পরিচিত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বর্ণ, সংহতি এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান বক্তৃতাটি অধ্যাপক ভিখু পারেখ প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ অব দি স্কু অব অরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজের সৌজন্যে। তারপর গান্ধী ফাউন্ডেশন, ইংল্যান্ড এটিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে।

গান্ধী ফাউন্ডেশন

গান্ধী শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভুমিকা রাখেন নি, তাঁর দার্শনিক শিক্ষার আবেদন বিশ্বজনীন। তাঁর দার্শনিক শিক্ষার মুল লক্ষ্যই হলো অহিংসতার ভেতর দিয়ে সত্যকে অনুসন্ধান করা।

মানুষের মতো তিনি প্রাণীর প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা বলেন। পরিবেশের সঙ্গে অ-শোষণবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলেন। ব্যক্তিগত সম্পদ এবং বিত্তের যে সংকট তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। জীবনের সকল স্তরে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের যে কোনো নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি অহিংসার প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন।

গান্ধীর চিন্তার বহুমাত্রিক দিকসমূহ নিয়ে গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটানোর লক্ষ্য নিয়েই ১৯৮৩ সালে গান্ধী ফাউন্ডেশন গড়ে উঠে। তারা একটি ষান্মাষিক পত্রিক *The Gandhi Way* প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সময় এ প্রতিষ্ঠানটি বক্তৃতা, ওয়ার্কশপ এবং প্রকামনার ব্যবস্থা করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির একটি অফিস রয়েছে পূর্ব লন্ডনের কিংসলে হল কমিউনিটি সেন্টারে। সেখানে অনেক বোদ্ধা এবং সমাজসংস্কারকদেও সমন্বয়ে ‘অহিংসার বিকাশ’ ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ভূমিকা

‘লেগাসি অব গান্ধী’ শিরোনামে বক্তৃতাটি প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ অব দি স্কু অব অরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজের প্রতি গান্ধী ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ১৯৯৫ সালের ৫-৭ অক্টোবর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ অব দি স্কু অব অরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালার অংশ হিসাবে অধ্যাপক ভিখু পারেখ ‘গান্ধীর লেগাসি’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

অধ্যাপক পারেখ তাঁর বক্তৃতায় গান্ধীর জীবন ও চিন্তার তিনটি দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর এসব চিন্তা আমাদেরকে ভাবিত করে। বিশেষ করে ‘মৌলবাদের স্বরূপ প্রসঙ্গে’, ‘মানব দুর্দশার উৎস ও সামাজিক পরিবর্তন’ এবং ‘মৌলিক মূল্যের পুনঃসংজ্ঞায়ন’ বিষয়ে গান্ধীর ভাবনা এ বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

গান্ধী মনে করেন প্রত্যেকটি ধর্মই ঈশ্বর এবং মানুষের স্বরূপ পর্যালোচনায় বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রদর্শন করে মাত্র। যেমন খ্রিষ্টানধর্মে ঈশ্বরকে দেখানো হয়েছে ‘প্রেমময় পিতা’ হিসাবে, ইসলাম ধর্ম ঈশ্বরের ‘একেশ্বরবাদ ও সমতাকে’ প্রাধান্য দেয়। তবে গান্ধী যে জীবনের ঐক্যনীতি (the principle of unity of life) এবং অহিংসনীতির (doctrine of non-violence) প্রস্তাব করেন তা হিন্দুবাদ থেকে স্বতন্ত্র। গান্ধী বিশ্বাস করতেন একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির কাছে সকলধর্মই সমভাবে ‘সুপ্রিয়’। প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজস্ব ধর্মীয় আবহে জন্মগ্রহণ করেন। আর এই ধর্মের মধ্যেই তিনি অনুসন্ধান করেন তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্যটি। এজন্য এক ধর্মের বিশ্বাসীদের অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া অপরিহার্য নয়। কিংবা জীবনদর্শন বা জীবনাচরণকে আলাদা করে উন্নত করারও প্রয়োজন নেই। গান্ধীর এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে মৌলবাদ-বিরোধী।

মানব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে ভিখু পারেখ উল্লেখ করেন : মহাত্মা মানবসত্তার পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় (interdependence of human beings) বিশ্বাস করতেন। গান্ধী মনে করেন মানব স্বভাবের মধ্যে যে বিভ্রান্ত বোধ-উপলব্ধি রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ‘আধিপত্য ও শোষণ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধী বলেন নিজেদের কল্যাণ ব্যতীত অন্যদের কল্যাণ সম্পন্ন করা যায় না। একজন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষতি না করে অন্য কারো ক্ষতি করতে পারে না। নানানভাবে আমরা অন্যদের কাছ দায়গ্রস্থ। একারণেই গান্ধী বলেন আমরা যখন আধ্যাত্মিকভাবে কেউ বিকশিত হয়, তখন গোটা বিশ্বই বিকশিত হয়। আবার কোনো একজন ব্যক্তি যদি কলুষিত হয় তখন গোটা বিশ্বই কলুষিত হয়।

গান্ধীর বিপ্লববাদী তত্ত্বটি তিনটি নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে : ১. মানবতার ঐক্য (unity of mankind), ২. লক্ষ্য এবং উপায়ের অবিভাজ্যতা (indivisibility of means and ends) এবং ৩. শুভ এবং মন্দের অবিচ্ছিন্নতা (inseparability of good and bad)। এই তিনটি মৌলিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন : লাঞ্ছিতদেরকে যেমন পরিপূর্ণ অর্থে অমহৎ বলা যাবে না, আবার অত্যাচারীকেও মন্দ বলা যাবে না। বঞ্চিতদের বুঝতে হবে পরিবর্তন বা বিপ্লব তাদের দু'জনের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই হতে হবে।

গান্ধীর ‘উদারবাদী মূল্যবোধকে’ বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক পারেখ স্বাধীনতা সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণটি সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। গান্ধীও বলেছেন নিজের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করতে এবং স্ব-প্রচেষ্টায় বেঁচে থাকতে। একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে ‘সংহতিপূর্ণ পছন্দ’ নির্বাচনের মধ্যে। আর স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির সত্যবাদী হবার পূর্বশর্ত। এর সঙ্গে গান্ধী ‘নাগরিকত্বের’ ধারণাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন করেন। তিনি মনে করেছেন কোনোপ্রকার চুক্তি বা ভয় অপেক্ষা সহযোগিতাই হলো রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। যদি কোনো আইন ন্যায়সম্মত হয় তাহলে নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব হলো তা মান্য করে চলা। আর কোনো আইন যদি অবৈধ আ অন্যায় হয় তাহলে নাগরিকের উচিত সেই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এমনকী সেই আইন অমান্য করা উচিত। অন্যায় আইন মেনে চলা মন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণের নামান্তর।

অধ্যাপক পারেখ লক্ষ করেছেন গান্ধী হলেন ‘চিন্তা ও কর্ম’ এই দুইয়ের সমন্বয়ে প্রতিপাদিত এক ব্যক্তিত্ব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুমাত্রিক সমস্যা রয়েছে : সন্ত্রাস, অপরাধ, দারিদ্র্য, বর্ণবাদ এবং অসততা। গান্ধী তাঁর জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে এসব সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। তিনি অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন সন্ত্রাসের সঙ্গে দারিদ্র্য এবং অন্যায় উভয়ের সংযোগ রয়েছে। এজন্য তিনি অহিংস তৎপরতার অংশ হিসাবে দারিদ্র্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করেছেন। তিনি একাধারে সবুজ আন্দোলনের হোতা, সততার অগ্রপথিক এবং শিক্ষার শক্তিতে শক্তিমান এক ব্যক্তিত্ব। ধর্মের প্রতি তাঁর যে মনোভাব তাই প্রমাণ করে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা এবং আন্ত-বিশ্বাসের উপলব্ধিতে শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব।

সর্বোপরি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধী ছিলেন এক যোগ্য ব্যত্তিত্ব। তিনি তাঁর জীবনে ‘প্রেমের নীতি’ কিংবা ‘সত্যাগ্রহের নীতি’ নিয়ে কোনো সীমা-পরীসীমা রাখেন নি। এজন্য অধ্যাপক পারেখ গান্ধীর জীবনকে আমাদের জন্য এক উৎকৃষ্ট দলিল হিসাবে মূল্যায়ন করেন।

অধ্যাপক পারেখের গান্ধী বিষয়ক এই জ্ঞানধর্মী বক্তৃতাটি গান্ধীর মর্মকথা বুঝতে সাহায্য করবে। এ বক্তৃতাটি একাধারে শিক্ষামূলক এবং উদ্দীপনামূলক। এই বক্তৃতাটি পাঠ করে আমরা শুধু গান্ধী সম্পর্কে তথ্যাদিই জানব না, বরং আমাদের এই জ্ঞানটিকে বিশুদ্ধভাবে জীবন-যাপনে কাজে লাগাব। ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে কোনো সমস্যা এর মাধ্যমে আমরা সমাধান করতে পারব।

সিসিল ইভানস
চেয়ার, গান্ধী ফাউন্ডেশন
ইংল্যান্ড

গান্ধী’স লেগাসি

‘সেন্টার অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ অব দি স্কুল অব অরিয়েন্টাল’ এবং ‘আফ্রিকান স্টাডিজ’ তাদের বার্ষিক বক্তৃতায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করছি কনফারেন্সের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ‘গান্ধীর দলিল’ এর সঙ্গে বক্তৃতাটির ভাবগত মিল রয়েছে। গান্ধীর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই বক্তৃতাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। গান্ধীর আজকের এই জন্মদিনটি বিশেষকারণে গুরুত্বের দাবি রাখে। গান্ধী বারবার দিপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন : এ সময় পর্যন্ত তিনি বাঁচতে চান।

দার্শনিক চিন্তার অংশ হিসাবেই তিনি বিশ্বাস করেছেন : দেহের উপর আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য রয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক কোনো দিক থেকেই একটি ‘সুশৃঙ্খল জীবন’ প্রথাগত বিধি-নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। গান্ধীর মৃত্যুর চার দশক পর আমরা লক্ষ করছি তাঁর অর্জনসমূহের উপর ভিন্ন ভিন্ন অভিমত আসছে। কেউ কেউ বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে বলছেন : গান্ধী আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন। তারা মনে করেন গান্ধী মূলত একজন কর্মী। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ একটি। গান্ধী সমালোচকগণ নানান মাত্রা থেকে গান্ধীকে মূল্যায়ন করছেন। তাদের অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেন : তাঁর র‌্যাডিকেল রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে লুকিয়ে ছিল রক্ষণশীল, বিশুদ্ধতাবাদী, প্রো-বুর্জোয়া এবং হতাশাবাদী চিন্তা চেতনা। একারণে তাঁর অচ্ছুৎ-আন্দালন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে তাঁর নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিকোণ ভারত-মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের উন্মেষকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এমনকী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও অনুশীলন করা নিয়েও জাতীয়ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভয়-আতঙ্ক অনুপ্রবেশ করেছে। যৌনতা নিয়ে তাঁর অবাস্তবসম্মত এবং সংশয়াপন্ন ধারণা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।

আবার যারা গান্ধী অনুরাগী তাঁরা গান্ধীকে ব্যাখ্যা করেছেন এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে। তারা মনে করেন গান্ধীর মননে 'চিন্তা ও তৎপরতার' এক অভিনব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। একজন চিন্তক হিসাবে তিনি লক্ষ করেছেন গোটা আধুনিকতা জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে অপতৎপরতা এবং পাগলামীপনা। এজন্য তিনি প্রাক-আধুনিকতা এবং আধুনিক বিশ্ববীক্ষার ইতিবাচক দিকসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এমন এক বিশ্ববীক্ষা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে যা সমকালীন রংচটা উত্তর-আধুনিকতার বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধীতা মুক্ত। এরকম বাস্তবতায় গান্ধী অনুরাগীদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের মধ্যে উৎকৃষ্ট চিন্তক কে? তারা নিসংশয়ে গান্ধীর নাম উল্লেখ করবেন। এমনকী এটাও বলবেন গান্ধীর বিকল্প অন্য কেউ নেই।

গান্ধী একজন কর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব। একই কর্মনিষ্ঠা আমরা লক্ষ করি তাঁর রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণে। গান্ধী বহুধাবিভক্ত ভারতবাসীকে সংঘটিত করেছেন উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। দেশবাসীর মধ্যে তিনি সাহস সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতবাসীকে কীভাবে একনিষ্ঠ এবং কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে দিকে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। হিংসার শক্তি ও প্রতিক্রিয়াকে তিনি অহিংসার শান্ত ও সৌম ভাবের সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে তিনি 'সুন্দর এক আত্মার' প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এই আত্মা এমন যে সে সকল প্রকার দয়া-করুণা, স্থূলতা এবং ভোগ থেকে অবমুক্ত থাকবে। এই ভাবনার ভেতর দিয়ে তিনি যৌনতাসহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোনোকিছুর সঙ্গে আপস না করে তিনি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক জীবন যাপন করতে পেরেছেন।

গান্ধীর কর্ম ও চিন্তা কোনো একসময় এতোটা সফল হবে যা ভেবে গান্ধীভক্তরা উচ্ছ্বসিত হতে পারেন। তারা সেসময় ভেবে অবাক হবেন যে গান্ধী কতোটা প্রভাববিস্তারকারী ছিলেন। তিনি এই মাটিতে একসময় পদক্ষেপ রেখেছিলেন। যেমনটি পদক্ষেপ রেখেছিলেন নাজেরাথের যীশু, কপিলাবস্তুর বুদ্ধ। আলবার্ট আইনস্টাইন গান্ধীর সত্তুরতম জন্মবার্ষিকীতে একই কথা বলেছিলেন : এমন এক প্রজন্ম আসবে যারা একদিন হয়তো ভেবে বিমুগ্ধ হবেন গান্ধীর মতো মহান মানুষ এই পৃথিবীতে পা রেখেছিলেন।[১]

যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার ৩৫ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো নির্দেশনা ছিল না যা প্রমাণ করতো ইতিহাসে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবাদের মতো কোনো কোনো আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। এই পৃথিবীতে তাঁর মতো এক মহান প্রভাবশালী ভাবুকের জন্ম হয়েছিল। ১৯১৫ সালের দিকে — কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০ বছর পর পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল একটি অকার্যকর রাজনৈতিক তৎপরতা। [অনেক পরে হলেও রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার চিন্তার যথার্থ বাস্তবায়ন হয়েছে।] সেই সময় হয়তো চলে এসেছে যা গান্ধীর ভাবনাকে ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টিকারী হিসাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।[২]

ঐতিহাসিকভাবে গান্ধীর অনেক ধারণাকে হীন করে দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক এবং নৈতিক মতাদর্শ ভারতসহ গোটা বিশ্বে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা অনাবিস্কৃত থেকে যাচ্ছে। তাঁর জীবনে যে নৈতিক সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্নতা রয়েছে তাও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় নি। আবার অনেকক্ষেত্রে গান্ধীর চিন্তা ও তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাসমূহ সম্পর্কে তাঁর ভক্ত অনুরাগীগণ বুঝতে না পারার কারণেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় গান্ধীকে একজন সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। কেউ তাঁর অনুরাগী কিংবা বিরাগী সে রকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে কারো বোধ-উপলব্ধিকে সামনে এনে গান্ধীকে বোঝা দরকার নেই। বরং গান্ধীর জীবন ও চিন্তার দিকে আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত। এ বিবেচনায় আমরা গান্ধীর চিন্তায় তিনটি দিককে আলোচনার জন্য নির্বাচন করতে পারি। তাঁর এ চিন্তা আমাদেরকে সমকালীন ভাবনার সঙ্গে সমন্বিত করে নেবে। পাশাপাশি সেসব বিষয়কে উপস্থাপন করবে যা গান্ধীর চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক দিক। তাঁর চিন্তার তিনটি দিক পর্যাক্রমে আলোচনা করা হলো।

গান্ধীর ধর্মীয় সার্বজনীনবাদ

সমকালীন বিশ্বে বিশেষ করে উন্নত রাষ্ট্রে ইউ.এস.এ, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতে ধর্মীয় মৌলবাদ হিংসা এবং যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিগত সমস্যা, জাতীয় সংহতির প্রশ্নে মৌলবাদ এক আতঙ্কিত ধর্ম। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মাচারের বিষয়ে তারা সকলসময় আধিপত্যবাদী এবং আপসহীন। আবার মৌলবাদ কখনোই ধর্মীয় চেতনা কিংবা বস্তুনিষ্ঠ ধর্মীয় ভাবনাকে মেনে নিতে পারে না। ধর্মীয় চেতনাকে যেসব নগন্য ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধী সেসব নগন্য ব্যক্তিদের একজন। তিনি মৌলবাদী ভাবনাকে ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন।

গান্ধী লক্ষ করেছেন প্রত্যেকটি মূলধর্মই ঈশ্বর সম্পর্কে এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকসমূহও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি মনে করেন ঈশ্বর হলেন অসীম — আর মানুষ হলো সেই অসীম ঈশ্বরের খণ্ডিত অংশ। এ বিবেচনায় প্রত্যেকটি ধর্মই বিক্ষিপ্তভাবে আংশিক এবং সীমিত। ধর্মসমূহ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হলেও মানুষের কর্মক্ষমতার সীমিত পরিসরে এবং অপর্যাপ্ত মানব ভাষার ভেতর দিয়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধী মনে করেন প্রত্যেকটি মানুষই বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। কোনো ধর্মকে ভ্রান্ত বলা যাবে না। এই ধর্মীয় বোধ-উপলব্ধির ভেতর দিয়েই ব্যক্তি তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হন। এখন কোনো ব্যক্তি যদি অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তিনি স্বাধীনভাবে সে ধর্ম থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন। একারণেই দেখা যায় ম্যাডোলিন গ্রেড যখন হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চেয়েছেন গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। গান্ধী ম্যাডোলিনকে বলেছিলেন : তুমি খ্রিস্টান ধর্মীয় বিশ্বাসেই থাক। বরং হিন্দু ধর্মে যেটুকু মহৎ এবং ভালো গুণাবলী রয়েছে সেটুকু গ্রহণ কর। কারণ ধর্মান্তরিত হওয়ার মধ্যে ব্যক্তিগত আচরণ বা জীবনভাবনার কোনো আমূল পরিবর্তন করা যায় না। ধর্মান্তরিত হওয়া নিত্যান্তই একটি ঘটনা মাত্র। এজন্য তিনি ম্যাডোলিনকে পরামর্শ দেন : যখনই তুমি তোমার ধর্মে কোনো সংশয় লক্ষ করবে কখন নতুন উদ্যেম ও শক্তি নিয়ে নিজ ধর্মের প্রতিই মনোনিবেশ করবে। আরেকজন আমেরিকান মিশনারী স্টেনলি জোন্স। তিনি বহুজনের নিকট বলেছেন :"গান্ধীই আমাকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আনুরক্ত হতে আগ্রহী করে তোলেছেন।" অন্য এক প্রসঙ্গে জোন্স তাঁর এক ইহুদী বন্ধু মিসেস পলাককে বলেছেন : কোনো 'একক সত্তা'য় উপনীত হবার জন্য তাকে খ্রিষ্টবাদী হবার প্রয়োজন নেই। জোন্স কোনো ইহুদীকে আক্রমণ না করার উৎসাহ উদ্দীপনা তা পেয়েছেন যিশুর জীবন ও চিন্তা থেকে।

ধর্ম একান্তই বৈশ্বিক জীবনের সন্নিকটবর্তী এক সাধারণ চিন্তা। অনেকটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতো। রাষ্ট্র যেমন ভয় বা আশঙ্কা থেকে তার ভূখণ্ড বা সীমানাকে রক্ষিত রাখে — মানুষও তেমনি তাঁর ধর্মকে আগলে ধরে রাখে। একই সঙ্গে কারো পক্ষেই অধিক সংখ্যক ধর্মে অবস্থান করা সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে একই সঙ্গে অনুশীলন করাও সম্ভব নয়। ধর্ম সম্পর্কে একদেশদর্শি বক্তব্যকে গান্ধী মেনে নেন নি। তিনি মনে করেছেন ধর্ম কোনো একরোখা মত বা পথ নয়। বরং ধর্ম হলো এমন এক ভাণ্ডার যেখান থেকে একেকজন অনায়াসে তার পছন্দমাফিক প্ররোচনামূলক ধারণা গ্রহণ করতে পারে। এবিবেচনায় ধর্ম হলো এক সাধারণ সম্পত্তি (common property) এবং মানব ঐতিহ্য (human heritage) । প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দিষ্ট ধর্মীয় কলেবরে বেড়ে উঠে এবং এর ভেতর দিয়ে সে তার নিজেকে পুনর্গঠন করে। ব্যক্তি আবার অন্যধর্মের বা সংস্কৃতির উপাদানসমূহকেও উপভোগ করে সেই মাত্রায় যে মাত্রায় তার প্রবেশাধিকার রয়েছে। একজন ভারতীয় হিন্দুধর্মাবলম্বী হিসাবে তিনিও উত্তরাধিকার সুত্রে হিন্দুধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্যের মালিক হয়েছেন। এজন্য তিনি গর্বও অনুভব করতেন। মানুষ হিসাবে ব্যক্তি তার স্বজাতির কাছ থেকে যা শিখে সেসব গোটা মানবজাতির জন্যও সম্পদ। একজন ব্যক্তি যখন তার 'প্রথা' ও 'সংস্কৃতির' গভীরে প্রবেশ করতে পারে সেখান থেকে সে অনায়াসে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান সংগ্রহ করতে পারে যা অন্যদের জন্যও সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। যে কোনো ক্ষেত্রে যেখানেই ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন রয়েছে সেটিকেই তিনি ধর্মীয় চর্চায় গ্রহণ করার পরামর্শ করেছেন।

গান্ধী ধর্মকে বদ্ধ না রেখে তাকে খোলসমুক্ত করে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। বদ্ধ ঘরে আলো বাতাস না ঢুকার কারণে স্যাতস্যাতে হয়ে যায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে। আবার দরজা-জানালা উন্মুক্ত কক্ষে আলো-বাতাসের ছড়াছড়ির ফলে সে কক্ষটিতে প্রাণের জোয়ার বয়ে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি একই রূপক ব্যবহার করেছেন। যে ধর্ম অন্যধর্ম থেকে কিছু গ্রহণ করতে ভয় পায়, নিরুৎসাহিত করে সে ধর্মকে তিনি 'প্রাণহীন ধর্ম' হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার যে ধর্ম তার মুক্ত বাতায়ন দিয়ে অন্যধর্মের আলো-বাতাস ঢুকতে দেয় — সে ধর্ম প্রাণাস্পদ হয়ে উঠে। গান্ধী মুক্ত জানালাকে পছন্দের উপাদান হিসাবে নির্বাচন করেছেন। যে কারণে তিনি বলেছেন : " জগতের সমস্ত মঙ্গলময় চিন্তা আমাদের দ্বারস্থ হোক " (ano bhadra ritavo yantu vishvatah)। গান্ধী স্বঘোষিত স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিপূর্ণ আস্বাদন গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। গান্ধী হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় মূলসমূহ কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করেছেন এবং স্বধর্ম এবং অন্যধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমালোচনাত্মক সংলাপে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে তিনি হিন্দু ধর্মের 'অহিংস নীতিকে' তাঁর নীতিদার্শনিক চিন্তার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোনো কর্মী বা সামাজিক-খ্রিস্ট্রবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টধর্মের 'কারিতাস' ধারণার ব্যাখ্যা বা পুর্নমূল্যায়ন করাকে নেতিবাচক এবং নিষ্ক্রিয় হিসাবে দেখেছেন। এটিকে গান্ধী আবেগাত্মক হিসাবেও দেখেছেন, এ ধারণাটি জগতের সঙ্গে মানুষের আসক্তি সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এমনকী এটি কর্তার আত্মতুষ্টির সঙ্গেও আপস করে। এজন্য গান্ধী এ ধারণাটিকে হিন্দু ধারণা 'অনাসক্তির' (non-attachment) সাহায্যে পুনব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। হিন্দুধর্মীয় ধারণাসমূহের খ্রিস্টানীকরণ, এবং খ্রিস্টানধর্মের ধারণাকে হিন্দুকরণকে তিনি এক ভিন্ন অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেন। এতে করে অনেক সক্রিয় এবং ইতিবাচক মহৎ ধারণাসমূহের উদ্ভব হয় যা একাধারে অচ্ছুৎ এবং অ-আবেগীয় প্রেমকে প্রতিফলিত করে। এর সঙ্গে তিনি প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে হিন্দুধর্মের প্রথাগত ধারণা 'অনশনকে' অনুশীলন করার পরামর্শ দেন। এই ধারণাটির সঙ্গে ইহুদী 'প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্বের' (representative leadership) ধারণাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। আবার এটি খ্রিস্টান 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' 'যন্ত্রণাকাতর প্রেম' ইত্যাদি ধারণাকে পারস্পরের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন। খ্রিস্টীয় 'মানবদেহের ঐচ্ছিক ক্রুসিফিকেশন' ধারণার সাহায্য নিয়ে তিনি মূলত 'অনাসক্তি ধারণার' বিকাশ ঘটিয়েছেন। তার শিষ্য বা সতীর্থরা যেন মন্দদৃষ্টি থেকে দূরে থাকে সেজন্য তিনি অনশনকে গ্রহণ করেছেন। এটি মানুষকে লজ্জা, পাপবোধ, অপরাধবোধ থেকে নিবৃত্ত করে। একই সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে থাকে।

গান্ধী মনে করেন ধর্ম কোনো কর্তৃত্ববাদী বিশ্বাস বা আচার-সর্বস্বতার 'সার্বভৌম পন্থা' নয়। আর এসব আচার সর্বস্বতাকে পরিহার করলে মানুষ শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করবে তাও নয়। আবার খ্রিস্টধর্মের বিধিবদ্ধ রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠানকে ব্যক্তিজীবনে অনুশীলন করলেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হওয়া যায় না। একইভাবে হিন্দু বা মুসলিম হবার জন্যও আচার অনুষ্ঠান পালন অপরিহার্য নয়। গান্ধী বলেন কোনো হিন্দু বা মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। বরং অখণ্ড মানবসত্তার ধারণাই পারে মুক্ত স্বাধীনভাবে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে।

কোনো একজন হয়তো যিশুর অনুরাগী/ ভক্ত হতে পারেন — সে মোতাবেক তাকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। একই সঙ্গে কোনো একজন ব্যক্তি সমনাভাবে বুদ্ধ, মূসা, মহাবীর এবং জরাথুষ্ট্রকে ধারণ করতে পারেন। নারী বা পুরুষ যে কেউ হয়তো কোনো বিশেষ ধর্মের অনুরাগী হতে পারেন। খ্রিস্টান অথবা মুসলিম অথবা বৌদ্ধ এসব ধর্মীয় প্রথায় কেউ কেউ অবস্থান করতে পারে, অথবা এসব ধর্মের যে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের পরিপূর্ণ অর্থে সন্তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু তারপরও একজন ব্যক্তি অন্যের ধর্মীয় ধারার বৈশিষ্ঠ্যসমূহ গ্রহণ করতে পারেন যা তাদের স্ব স্ব ধর্মে অংশ হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে। কোনো একজন হয়তো গান্ধীর চিন্তা নিয়ে ভাবতে পারেন। গান্ধী মূলত 'মৌলবাদের' সঙ্গে 'ধমীয় আইডেনটিটির' প্রতিনয় সম্পর্ক (anthithesis)) আবিষ্কার করেছেন। অন্যসব আইডেনটিটির মতো ধর্মীয় আইডেনটিটিও 'বদ্ধ এবং

মুক্ত' 'স্থির এবং পরিবর্তনশীল' উভয়ই। ধর্মীয় আইডেনটিটি ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধির ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। গান্ধী মনে করেন সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আইডেনটিটির কোনোটিই আদি এবং অবৈকল্পিক নয়। এসব বিষয়ে মৌলবাদীরা যেমনটি ভাবেন (সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আইডেনটিটি হলো আদি এবং অবৈকল্পিক)আসলে তা নয়। এমনকী বস্তবাদী বুদ্ধিবাদীদের ধারণার মতোও নয়। ব্যক্তির মধ্যে যে আত্ম-পুনর্গঠন সম্পন্ন হয় তাও ব্যক্তির নিজস্ব প্রথা এবং অন্যদের প্রথার পরিবর্তিত চাহিদা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন

গান্ধী অন্যান্য যে কোনো লেখক বা ভাবুক অপেক্ষা স্পষ্টভাবে মানুষের স্বাধীনতা এবং মানুষের উপর আরোপিত আধিপত্যের স্বরূপটিও দেখিয়েছেন। আধিপত্যের সকল ধরণসমূহ মূলত মানব চরিত্রের ধরণটিকে ভুলভাবে বোঝার কারণে হয়ে থাকে। এই ভুল উপলব্ধির কারণেই গোষ্ঠী বা ব্যক্তি মনে করে নিজেদের কোনোপ্রকার ক্ষতিসাধন না করে অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে অনিবার্যভাবে মানুষ স্বাধীন ও স্বনির্ভর। জৈবিকভাবে মানুষ আবার 'জৈবিকসমগ্রও' (organic whole)।[৩] যেমন একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল। তাদের আত্মত্যাগ ব্যতীত ঐ ব্যক্তির পক্ষে টিকে থাকা কিংবা বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। একটি শান্তিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি বেড়ে উঠে এবং তার শক্তিমত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এটিও আবার সম্ভব হয়ে উঠে হাজার হাজার নারী পুরুষের প্রচেষ্টা ও নির্বোরোধ আত্মত্যাগের ফলে। তীক্ষ্ণ জ্ঞানী, সাধু সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টার যে ফসল উন্নত সভ্যতা — সেই সভ্যতায় বসবাসকারী জনগণই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে উন্নত এবং প্রতিফলিত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। প্রত্যেকে তার মানবত্বকে অন্যের মধ্য দিয়ে খোঁজে ফিরে, জগতের নানাকিছু থেকে সে উপকার পেয়ে থাকে। গান্ধী এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই বলেন : মানুষ জন্মায় ঋণগ্রস্থ হয়ে, অন্যের কাছ থেকে লাভ-সুবিধা পাবার জন্য। উত্তরাধিকারসূত্রে তার এই ঋণ পরিশোধ করা দুঃসাধ্য।

গান্ধীর চিন্তাকে মানবদেহ রূপকের সাহায্যে বোজা যেতে পারে। মানুষের দেহকে চিন্তা করা যেতে পারে একটি 'জৈবিক সমগ্র' (organic whole) হিসাবে। ঠিক একইভাবে সামাজিক জীবনেও মানুষ অনিবার্যভাবে এক 'নির্ভরশীল সত্তা'। প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকাণ্ডই একই সঙ্গে আত্মগত এবং পরনির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এসব আমাদের সামষ্টিক মূল্যের (collective ethos) উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পাশাপাশি এমনসব মানবীয় গুণাবলী রয়েছে যা মানুষের আন্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখতে পারে। খুব কাছ থেকে দেখা না গেলেও এসব অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল এ জগতেরই মুক্তস্বরূপ।[৪] উদ্ভিজ্জ বা অনুজীবসমূহ গোটা প্রক্রিয়াকে দূষিত করে থাকে। মানুষ যখন নিজেই তার বিকাশ ঘটায় এর মধ্য দিয়ে সে আবার অন্যদের সামর্থ্য অনুসারে জাগিয়ে তোলে। উৎসাহ, উদ্দীপনায় স্বতস্ফূর্ত করে তোলে। এই মানুষ যখন অমানবিক কর্মকাণ্ড করে তখনই সে নিজে এবং অন্যারা কষ্টের স্বীকার হয়। এমনকি ক্ষুদ্র কোনো অপরাধও নিরাপত্তাহীনতার মতো মামুলি ধারণাসমূহ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। সংশয়-সন্দেহকে বড় করা দেখা, গোটা সম্প্রদায়ের নৈতিক উৎকর্ষকে ছোট করে দেখাও এ নিরাপত্তাহীনতার কারণ। "এজন্যই আমি বিশ্বাস করি একজন ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিকভাবে জয়ী হতে পারে তাহলে সে গোটা বিশ্ব তার সঙ্গে জয়ের রথে থাকে, একইভাবে একজন ব্যক্তির যদি পতন হয় তাহলে গোটা পৃথিবী এর সঙ্গে পতিত হয়।"[৫]

গান্ধী মনে করেন মানবতা হলো অবিভাজিত বাস্তবতা। এটি অনেকটা এরকম : একজন ব্যক্তি নিজেকে অধপতিত না করে, নিজেকে হিংস্রতার মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে সে কখনোই অপরকে অধপতিত কিংবা হিংস্রতা প্রদর্শন করতে পারে না। কাউকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঘাত করে কিংবা নৈতিকভাবে বিনষ্ট করা যাবে না যদি না সে নিজেকে এসবের বলি করে। এটি অন্তত তিনটি দিক থেকে সম্পন্ন হতে পারে :

১. অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার অর্থই হলো মানুষকে হেয়ভাবে মূল্যায়িত করা। আর যারা হেয়ভাবে প্রতিপন্ন হবে তাদের কাছে প্রত্যাশিত নৈতিকতার স্তরও হবে ন্যূনতম।

অন্যভাবে বলা যায় যদি কোনো একজন ব্যক্তি অন্য কারো ন্যূনতম ক্ষতি করে তাহলে সেটুকু ক্ষতি সমগ্র জগতের জন্য করা হয়।

২. অন্যদের প্রতি অমানবিক আচরণ করার ভেতর দিয়ে মূলত তাদের আত্মমর্যাদা, আত্মাভিমান, শুভ সব তৎপরতা এবং ব্যক্তিকে অস্বীকৃতি করা হয়। এতে করে এ জগত তাদের যে কোনো অবদানঃ নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. নৈতিক এবং আত্মসমালোচক হিসাবে মানুষ কখনোই অন্যদের প্রতি অবমানিত এবং মন্দ আচরণ করতে পারে না। কারণ অন্যদের আঘাত করা ব্যতীত,আত্ম-বিচারের স্বরূপকে বিপর্যস্ত করা ব্যতীত, ব্যক্তির নৈতিক সংবেদনশীলতাকে বিপর্যস্ত করা ব্যতীত এবং ব্যক্তির নিজের এবং সামগ্রিক মানবতাকে হেয় করা ব্যতীত এই অবমাননা সম্ভব নয়। গান্ধীও মনে করেন নিজেকে নিম্ন পর্যায়ে না নামিয়ে অন্যকে নিচে নামানো যায় না। অথচ আমরা জানি মানবত্ব হলো অবিভাজিত, আর মানুষের মৌলিক-স্বার্থসমূহ হলো সংহতিধর্মী। প্রত্যেক মানুষই নিজের প্রতি অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল। প্রত্যেকটি মানুষই অন্য মানুষের জীবন-যাপন সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত।

গান্ধী যে অবিভাজিত বা অখণ্ড মানুষের ধারণার কথা বলেছেন তা-ই মূলত আধিপত্যবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে এক সমালোচনা। একইভাবে তিনি দেখান দক্ষিন অফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য, ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য, প্রত্যেকটি সমাজের ধনী এবং শক্তিশালীদের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে যে বঞ্চনা ও শোষণ করা হচ্ছে তাতে আধিপত্যবাদী শক্তি হয়তো কল্পনা করতে পারে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবমাননা করা কোনোভাবেই নিজেদেরকে অবমাননা করার সামিল নয়। বস্তুত আক্রান্তকারী আক্রান্ত ব্যক্তির সমপর্যায়ের কিংবা তারও অধিক দুখ-কষ্টের শিকার হতে পারেন। নিজেদের অন্তর্গত সংশয় ও অনুভূতি দ্বারা অবদমিত হওয়া ব্যতীত, নিজেদের আত্মসমালোচনা ও পক্ষপাতহীন আত্ম-মূল্যায়নকে ধ্বংস করা ব্যতীত, আক্রান্তকে নৈতিক বঞ্চনার মধ্যে নিপতিত করার মাধ্যমে, ভয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এবং অযৌক্তিক অবদমন সৃষ্টি করা ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ দক্ষিন আফ্রিকানরা কৃষ্ণাঙ্গদের মর্যাদাকে হেয় কিংবা নিজ বসতভিটা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। আসলে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি হিংস্রতা দেখানোর মাধ্যমে মূলত তারা নিজেদের প্রতিই হিংস্রতা দেখাচ্ছে। নিজ বসতভূমিতে যে দুঃখ-যন্ত্রণা, শুন্যতা ও হাহাকারের সৃষ্টি হয় তা ভেবেই তাদের প্রতি প্রতিহিংসা প্রতিরোধ করা যায়। এসবের মধ্য দিয়ে হয়তো তারা বস্তু গত স্বচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে, কিন্তু তারা (শ্বেতাঙ্গরা) অধিক সুখী কিংবা উৎকৃষ্ট মানব এর কোনোটাই হতে পারে না। ঔপনিবেশিক শাসকরাও একই ভাগ্যের শিকার হন। কারণ নিজেদের কোনোপ্রকার কঠোর ভাবা ব্যতীত, অধিকতর-পুরুষতান্ত্রিক, আবেগহীন-পরিপক্ক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করা ব্যতীত ঔপনিবেশবাসীকে 'নারীসুলভ' কিংবা 'শিশুসুলভ' ভাবা যায় না। ঔপনিবেশবাসীকে ভ্রান্তভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদেরকেই ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করে । ঔপনিবেশিক শক্তি ঔপনিবেশবাসীদের সঙ্গে যে আচরণ করে, তাদের সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে, অভ্যাস অর্জন করে তা মুলত তাদের নিজেদের সমাজকেই কলুষিত করে। উপনিবেশবাদ নিজেদেরকে বিত্ত বৈভবে সমৃদ্ধ করলেও তার জন্য তারা হারিয়ে ফেলে তাদের বৃহত্তর, অসীম এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদকে। এজন্য গান্ধী বস্তুগত সম্পদকে করণিক তাৎপর্যের (instrumental significante) দিক থেকে দেখেছেন। আর সম্পদ অর্জনের ভেতর দিয়ে যখন কারো নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় তা একান্তই ক্ষতিকর।

গান্ধী তাঁর মানব ঐক্যের ধারণার (concept of human unity) সাহায্যে 'সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্বের' উপনীত হন।[৬] তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন কোনো আধিপত্যবাদী সম্প্রদায়ই সংগ্রাম ব্যতীত তার ক্ষমতার বাসনাকে পরিহার করতে পারে না। কিন্তু এ সংগ্রামকে পরিপূর্ণ অর্থে বিপ্লববাদী তত্ত্বের মাপকাঠির নিরিখে ধারণাগত মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি বিপ্লবই সহিংসার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এমনকি এর মাধ্যমে উৎকৃষ্ট সমাজও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ ব্যর্থতা কিন্তু দুর্ঘনাজনিত কোনো বিষয় নয়। বরং জগত সম্পর্কে যে ম্যানিকিয়ান

দৃষ্টিকোণ রয়েছে তাই বিপ্লববাদী তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এ তত্ত্ব ভালো এবং মন্দকে আলাদা করে বিবেচনা করে এবং মানব অস্তিত্বকে মনে করে জীবন-মরণের সংগ্রাম হিসাবে। মন্দকে রহিত করা ব্যতীরেক অন্য কোনো মহৎ কারণ থাকতে পারে না, এমনকি গণ-সহিংসার মাধ্যমে হলেও মন্দকে পরিহার করার বিষয়টিকে যথোচিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 'মন্দের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না' — এরকম ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে বিপ্লববাদী নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত। মন্দকে তারা বিবেচনা করে মানবতারই এক খেসারত হিসাবে। এরই সঙ্গে তারা মানবজাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠার দাবী করে। কিন্তু গান্ধী মনে করেন 'ভালো' এবং 'মন্দ' ধারণাগত এবং অস্তিত্বগত দুই দিক থেকেই অবিচ্ছিন্ন। বিশেষ কোনো পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত কিংবা মানব আন্তসম্পর্কের কোনো বাস্তবতা ব্যতীত কোনোকিছুই পূর্ণতর ভালো নয়। কোনো এক বাস্তবতায় যা ভালো অন্য বাস্তবতায় তা ভালো নাও হতে পারে। যদি বিশেষ কোনো প্রণোদনা বা দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোকিছুকে দেখা হয় সেখানেই ভালো মন্দে রূপান্তরিত হয়। আবার কোনো একজন ব্যক্তির জন্য যা কিছু ভালো অন্য ব্যক্তির জন্য তা ভালো নাও হতে পারে। যেমন অনেকসময় দেখা যায় মঙ্গলজনক একটাকিছু অর্জন করার জন্য একজন নৈতিক কর্তা তার সময়, অর্থ, শক্তি এবং আবেগজনিত শর্তসমূহ নিস্বার্থভাবে ত্যাগ করে থাকে। প্রত্যেকটি মঙ্গল কর্ম প্রচেষ্টারই পুরস্কার রয়েছে, আবার অনিবার্যভাবে ভালোকে কেন্দ্র করে মন্দ বিরাজমান থাকে। জগতে কোনোভাবেই ভালো এবং মন্দ পরস্পরের প্রতিক্রিয়া ব্যতীত বা অংশগ্রহণ ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। অর্থাৎ মন্দের অংশগ্রহণ ব্যতীত ভালোর কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার কোনো মন্দই ভালোত্বের উদ্দীপনা ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। এভাবেই ভালো এবং মন্দ অবিচ্ছিন্ন, পরস্পরকে পৃথক করা যায় না। এমনকী সামাজিকভাবে এদেরকে আলাদা করা যায় না, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র বা সম্প্রদায়ের উপর আরোপও করা যায় না। একটি গোষ্ঠীতো ব্যক্তিরই সমষ্টি। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালো এবং মন্দ গুণাবলীর বাহক। ব্যক্তির ভালো মন্দই গোষ্ঠীর ভালো-মন্দ। এমনকী যদি কোনো একজন নিরপরাধ ব্যক্তি সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয়, লিখিত কিংবা অলিখিত কারণে অন্যায় সামাজিক তৎপরতার শিকার হয় তাহলে সেখানেও যৌথভাবে মানুষই তার দায়-দায়িত্ব নিবে। এসব কারণেই মানবতাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। যেখানে একটি শ্রেণী যারা দুর্বিনীত কেবল তারা মানবতার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে, আর যারা তাদেরকেকে শাস্তি দেবে তারা হলো সুবিধাভোগী শ্রেণীর। এরকম বিভাজন দ্বারা বোঝায় না যে কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী মন্দভাবে আচরণ করবে না, এবং যদি করে তাহলে তাদেরকে বাধা দিতে হবে।

গান্ধী এমন এক নতুন বিপ্লবী মতবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন যা সনাতন মতবাদের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এবং কাঠামোগতভাবেই সহিংসতা পুনরুৎপাদনকে রহিত করতে পারে। এ ধরনের মতবাদ' 'মানব ঐক্যের' তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত : লক্ষ্যের অবিভাজ্যতা, পন্থা বা মাধ্যমের অবিভাজ্যতা এবং জগত সম্পর্কে অ-ম্যানিকিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি। এটি শুধু আধিপত্যকামী শক্তির স্বার্থই সংরক্ষণ করবে না, বরং অবদমিত জনগোষ্ঠী সহ সকলের অংশগ্রহণমূলক স্বার্থের (shared interest) উপর ভিত্তি করে দাঁড়াবে। গান্ধী মনে করেছেন উপনিবেশবাদ একইসঙ্গে বৃটিশ এং ভারতীয়দের ক্ষতিসাধন করেছে। একই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা নৈতিক এবং আবেগীয় উভয় অবক্ষয়কই ত্বরান্বিত করেছে। শুধু তাই নয় অস্পৃশ্যতার মতো হিন্দুদের জাত-পাতের বিষয়টিও রয়েছে। কেবল এদের বিলোপ করার মাধ্যমে সম্ভব উভয়ের স্বার্থকে উর্ধ্বে তোলে ধরা। বিপ্লবকে তখনই যুক্তিযুক্ত বলা যাবে যখন কোনো একটি সমাজ একদল প্রভুর বদল করে অন্য একদল প্রভুকে স্থনান্তরিত করবে না, এবং নির্বিশেষ শ্রেণী শাসনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে।

মার্কসের মতো গান্ধীও মনে করেন মানবীয় কষ্টের প্রতি তীব্র সংবেদনশীলতাই বিপ্লববাদী চেতনার উদ্রেক করে। এ মতবাদ নিপীড়িতদের প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীল। তবে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর মতামত মার্কস থেকে। তিনি বলেন নিপীড়িত পরিপূর্ণ অর্থে মহৎ এরকমটি ঠিক নয়, তাদেরও মানবীয় দোষ-ত্রুটি রয়েছে। আবার যারা শাসক বা আধিপত্যকামী তারাও যে মানবীয় গুণাবলী শূন্য তাও ঠিক নয়। তবে নিপীড়িত এবং নিপীড়ক উভয়েই এমন এক আত্ম-পুনরুৎপাদন

প্রক্রিয়ায় নিয়ে যান যা হীন ও হিংস্রতা দ্বারা আচ্ছন্ন। এরকম অবস্থা থেকে নিপীড়ক এবং নিপীড়িত উভয়কে মুক্ত হওয়া উচিত। তবে এ দুইয়ের মধ্যে নিপীড়ক বেশিমাত্রায় অসংহত এবং হিংস্র। কিন্তু নিপীড়িতকে মুক্তির প্রতি সজাগ থাকতে হবে এবং মুক্তি-প্রক্রিয়ায় তাকেই প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে। নির্যাতিতকে নৈতিকভাবে অবদমিত না করে কখনো কোনো নিপীড়ণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে না। আবার নৈতিক সহযোগিতা ব্যতীতও তা বিলোপ সাধন করা যাবে না। নিপীড়ক প্রভূদের আশ্বস্ত করতে হবে বিপ্লব তাদেরকে শারীরিকভাবে বিলোপ করবে না, বরং এটি তাদের জন্যও মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। এর মধ্যে তারা মানুষ হিসাবে যে বিশুদ্ধতা এবং মর্যাদা পাওয়া উচিত সেটুকু প্রদান করা হবে।

প্রচলিত বিপ্লববাদী ধারার মধ্যমনি হিসাবে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্বি-বিভাজন (means-end dichotomy) রয়েছে গান্ধী তাকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করেন। মানব জীবনে 'তথাকথিত উদ্দেশ্য' মানব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। সংজ্ঞাগত কারণে এদেরকে নৈতিক বিচারের বাইরে রাখা যায় না। আবার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার যে সংগ্রাম করি তাও বাহ্যিক কোনো অংশ নয়, বরং অন্তর্নিহীত অংশ। প্রত্যেকটি অভিপ্সু লক্ষ্যভিমুখী পদক্ষেপই ঐ লক্ষ্যের স্বরূপটি উন্মোচিত করে, এজন্য প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত যাতে করে এর লক্ষ্য কোনোভাবে বিপর্যস্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কর্মকাণ্ডের শেষে কোনো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য মূলত কর্মের শুরুতেই বিদ্যমান থাকে। 'তথাকথিত উদ্দেশ্য' একটি প্রজননগত দিক রয়েছে। যেমন একটি বীজের 'তথাকথিত উদ্দেশ্য' হলো ফুলে পরিণত হওয়া। সুতরাং কোনো একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনোই অন্যায় উদ্দেশ্য দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না।

গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ তত্ত্ব' যাকে তিনি আত্মার ব্যাবচ্ছেদ বলেছেন, তা মূলত প্রচলিত বিপ্লববাদী তত্ত্বের বিকল্প।[৭] বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা জন্য এটি বড় মাপের কোনো 'অহিংস পদ্ধতি' নয়, যেমনটি বিপ্লবের মহৎ সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে। ট্রটস্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' ধারণার মতোই এটি। পদ্ধতিগত দিক থেকে তার দৃষ্টিকোণ 'শান্ত-মৃদু'। কিন্তু এটি আবেগীয়, আদর্শিক। তিনি মনে করেন এবং নৈতিক বাধাসমূহ দূর করার জন্য সামাজিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। সামাজিক সহানুভূতি এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াসটিকে মুক্ত করে দিতে হবে।

প্রত্যে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার অন্যতম শর্ত হলো ন্যায়-জ্ঞান বৃদ্ধি করা, অংশগ্রহণমূলক মানবিক বোধ-বিবেচনাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য, এবং ন্যায়কে গতিশীল করে তোলার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে 'অবিভাজ্য মানবত্বের' তত্ত্বভিত্তিক নীতির উপর মানবতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। মানব প্রজাতি পরস্পর পরস্পরকে উপলব্ধি করবে, গুণগতভাবে সমৃদ্ধ হবে। এর মধ্য দিয়ে সে বোঝে যাবে অন্যকে অধপতিত, অন্যের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করলে প্রকারান্তরে তা নিজেকে অধপতিত করা হয়, নিজেরর প্রতিই হিংস্রতা দেখানো হয়। মানবত্বের ধারণা এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে যার মুলধন হলো নৈতিকতা, এটি ব্যতীত কোনো সমাজই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এমনকী এটি ব্যতীত অন্যায়পরতা, শোষণ-বঞ্চনা এবং নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করা যায় না। মানবতার ধীর-স্থির এবং সহনশীল ধারা একটি সত্যভিত্তিক নৈতিক সমাজের ভিত্তি। 'সত্যাগ্রহ' সেরকম সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করে।

সত্যাগ্রহ 'প্রেমের সংকট' দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। আমরা যদি অসত্যের কারণে দ্বন্দ্বে উপনীত হই, সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংলাপে যেতে পারি। আমাদের কোনো দায়িত্বহীন সামাজিক অনুশীলনের মাধ্যমে এটাকেও যদি অস্বীকার করা হয় কিংবা হ্রাস করা হয় সেসব ক্ষেত্রে শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। প্রতিপক্ষের মধ্যে নৈতিক ভাবাবেগ সৃষ্টি করা প্রত্যেকটি ব্যক্তির দায়িত্ব। প্রতিপক্ষ নমনীয় করার সকল দায়িত্ব তার উপরে, তাকে কোনোপ্রকার উত্যক্ত, বিরক্ত, আতঙ্ক সৃস্টি করা কিংবা ক্ষুব্ধ করে তোলা যাবে না। এসবের ভেতর দিয়ে প্রতিপক্ষ শান্তি ভোগ করবে, কোনোধরনের ঘৃণা, মন্দ-ইচ্ছা ব্যতীতই এটি ঘটবে। ধীরভাবে ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-বিবেচনার মতো জটিল প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল করবে। প্রতিপক্ষ যখন সদিচ্ছা সদ্ভাবের মনোভাব নিয়ে সংলাপে আসতে যাবে ধরে নিতে সেই মুহূর্তে সে সহিংসতা ও সংগামের পথ পরিহার করে অধিকতর শান্ত-সৌম আবহে কাজ করতে চাচ্ছে।

সকল সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠে বলতে হয় গান্ধীর সত্যাগ্রহ মতবাদ রাজনৈতিক পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ন্তদৃষ্টি। তিনি বুদ্ধিবাদীদের মতো বৌদ্ধিক-আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন। অনেকক্ষেত্রে সেখানে মনে হবে আমরা বোদ্ধাদের (বুদ্ধিবাদীদের) মতো কথা বলছি অথচ সেখানে ভালো কোনো ফলাফলের জন্য অন্য কোনো বিকল্প আছে সেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর জোর দেওয়াও একধরনের অ-বৌদ্ধিকতা। গান্ধী বৌদ্ধিকতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে সজাগ ছিলেন, তবে তিনি হিংস্রতার ভয়াবহতা নিয়ে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝতেন সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদ এবং সহিংসতা উভয়েই পরস্পরের সহযোগী। আবার বৌদ্ধিকতার ব্যর্থতাই নৈতিকভাবে সহিংসতার জন্য দায়ী। প্রথাগত বুদ্ধিবাদের ভিত্তি হিসাবে যে দ্বিবিভাজন রয়েছে গান্ধী তা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। তিনি যুক্তি-সহিংসতার মধ্যকার যে বিভাজন রয়েছে তা সনাক্ত করেই রাজনৈতিক প্রাক্সিস এর মহৎ স্বরূপটি উদঘাটন করেছেন। এসব বিবেচনায় গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' সংলাপের নতুন স্বরূপ উন্মোচন করে, আলোচনার নবতর পথ মুক্ত করে দেয়। এসবের ভেতর দিয়ে তিনি মূলত বুদ্ধিবাদের এক ভিন্নতর, অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর মতবাদ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তবে এ মতবাদ সংকীণ দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিবাদী নয়, আবার অবৌদ্ধিকও বলা যাবে না। সত্যাগ্রহ মানুষকে বৌদ্ধিকতা ও মঙ্গলের জন্যই সক্রিয় করে তোলে। সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে সত্য — স্বতপ্রবৃত্তি এবং গভীর প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেই সত্যে উপনীত হতে পারি।

মূল্যের পুনঃসংজ্ঞায়ন

গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের ধারণাগত ব্যাখ্যা এবং এর সঙ্গে তাঁর দর্শনের কতগুলো মৌলিক ধারণা প্রসঙ্গে জানা যেতে পারে। সেগুলো হলো : স্বরাজ, সমতা, নাগরিকত্ব, অধিকার, বাধ্যবাধকতা বা ধর্ম এবং সহিষ্ণুতা। এগুলো সবকয়কটি অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন। গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি বিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্য আরো হিন্দু দার্শনিকদের মতো গান্ধীও মানব-প্রকৃতির স্বরূপ অম্বেষায় কিঞ্চিত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি মানুষ সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র, নৈতিক এবং নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিকাশের নিয়মটি অনুসরণ করেন। মানুষের রয়েছে নিজস্ব স্বভাব, যা স্বতন্ত্র এবং সতেজ। তবে তা অনায়াসেই তার কাঠামো বা চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। এটাও সত্য যে প্রত্যেকটি মানুষই সাধারণভাবে কতগুলো গুণাবলী ধারণ করে। কোনো ব্যক্তির অন্যন্য কাঠামোকে বিচার করার জন্য এসব গুণাবলী খুবই সাধারণ এবং অনির্ধারিত। বৃহৎ পরিসরের দিক থেকে এসব গুণ আবার নিষ্ক্রিয়, যান্ত্রিক কিংবা উদ্দেশ্যবাদী কার্যকারণিক দিক থেকে ক্রিয়াশীল নয়। এরা মানীয় আচরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ্য। আবার এটাও টিক যে 'মানুষ স্বরপ' এমন যে এর কোনো ব্যাখ্যাধর্মী ক্ষমতাও নেই। গান্ধীর নিকট এর কোনোপ্রকার তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক তাৎপর্যও নেই।

গান্ধীর মতে ব্যক্তির মধ্যে যে স্বভাব (swabhava) বিদ্যমান তার তিনটি উৎস রয়েছে[৮]:

প্রথমত, সে দৈহিক, মানসিক কাঠামোগত, জৈবিক-প্রকৃতিগত, এবং প্রবণতার ভেতর দিয়ে নি কে জন্মের কাছে উৎসর্গ করে। এটা হলো গান্ধীর জীবনের প্রথমদিকের ভাবনা। কিন্তু আমরা এ ধরনের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করছি না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। এই সম্প্রদায়ই ব্যক্তির অভ্যস, চরিত্র,স্মৃতি, আদর্শ এবং মূল্য নির্মাণ করে। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি স্বতন্ত্র ধারায় তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে।

উপর্যুক্ত দুটি উৎস একত্রিত হয়ে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক স্বভাব গড়ে তোলে। এগুলো আবার সমাজ বহির্ভূত কিছু বিষয় এবং সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি দ্বারা অর্জিত। এগুলোই ব্যক্তির ব্যক্তিক-পরিচিতির (personal identity) ভিত্তি। এর মধ্য দিয়ে সে ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হবার বিষযটি তার তত্ত্ববিদ্যক ভিত্তি। এটিই 'সত্য' (satya)। সংস্কৃত শব্দ 'সত্য' শব্দটি 'সৎ' থেকে উদ্ভূত। এটি মূলত রিয়েলিটিকে বোঝায়। সৎ এর বিপরীত হলো 'মায়া'।

'মায়া'র অর্থ হলো অধ্যাস, ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী কোনোকিছু। কোনোকিছু সাপেক্ষে 'মায়া' সত্য হতে পারে।

ব্যক্তির দ্বারা সত্য সীমায়িত হতে পারে, পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু সত্য কখনোই ব্যক্তির সিদ্ধান্ত এবং পছন্দের উপর নির্ভর করে না। বুদ্ধিজীবী সত্তা হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে যে অর্ন্তদৃষ্টি, আত্ম-সমালোচনাধর্মী প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং পছন্দ নির্বাচন করার সামর্থ্য রয়েছে তার সাহায্যে সে তার আত্মপরিচিতির অন্তর্গত উপাদানসমূহ উন্মুক্ত করতে পারে, সে সম্পর্কে সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ করতে পারে। এসবের আলোকে সে তার আত্মপরিচিতির কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পুনর্গঠন করতে পারে। ব্যক্তি স্বরূপের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা গভীর অনুসন্ধান এবং আত্মবিচারের মাধ্যমে উদঘাটন করা উচিত। অনেকসময় ব্যক্তি কোনোপ্রকার অতিমানবীয় সাহস ছাড়াই কোনোকিছুকে পরিবর্তন করার জন্য আত্মবিচারের উদ্যোমী হয়। এসব কারণে বলা যায় ব্যক্তি চরমভাবে যেমন স্বাধীন নয়, তেমনি সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারাও প্রভাবিত নয়। তবে কিছু সীমাবদ্ধতাসহ ব্যক্তি হলো স্বাধীন-মুক্ত। তবে সে সীমাবদ্ধতার গভীরতা ও পরীসীমা সকলের কাছে কখনোই একরকম ছিলো না, এবং তা হবেও না। আত্ম-সমালোচনা, নৈতিক-সততা, ইচ্ছা-ক্ষমতার সামর্থ্য এবং যে সমাজে ব্যক্তি বসবাস করে তার প্রকৃতির উপর এসব সমালোচনার উপাদানসমূহ নির্ভর করে। সহানুভূতিশীল এবং উদার সমাজের কথা ধরা যাক যার সদস্যেরা পরস্পর তাদের কাজ বা আচরণের মুক্ত-মূল্যায়ন করতে পারে এবং আত্ম-জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে সেরকম সমাজ আন্ত-যোগাযোগ এবং পারস্পরিক-বিনিময়ের জন্য খুবই সহায়ক। অন্য যে সমাজ তার সদস্যদের পরস্পর থেকে দূরে রাখে সেরকম সমাজ থেকে পূর্বোক্তটি উৎকৃষ্ট এবং সহায়ক।

কীভাবে চরম স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, কিংবা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় গান্ধী কিংবা অন্যান্য হিন্দু চিন্তাবিদদের আলোচনার বিষয় তা ছিলো না। তাদের চিন্তার বিষয় ছিলো কীভাবে একজনের সত্যকে সহনশীলভাবে পরিবর্তন করা যায় তার পথ দেখানো। জগতের বিরামহীন পরিবর্তনের মুখোমুখি আমাদের আত্মাও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তিত হয়। এর মধ্যে আমাদের সমালোচনাধর্মী আত্ম-চিন্তা অবিরত ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। একজন নৈতিক সত্তা প্রতিনিয়ত এসব অতিক্রম করার প্রচেষ্টা চালায়। কীভাবে বদলাতে হবে, একজনের তত্ত্ববিদ্যক বাস্তবতা না হারিয়েও কীভাবে বিকশিত করা যায়, কোনোপ্রকার ভারসাম্য এবং সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে কীভাবে নতুনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় এবং নতুন সত্তা পুনর্গঠন করা যায় — এসব মিলিয়েই বেঁচে থাকার কৌশল গঠিত হয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অসম্ভব আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আবার তার সাংগাঠনিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে সে সংহতির মধ্যে বসবাস করে। 'সত্যের নিয়মানুসারে' চূড়ান্ত লক্ষ্যে যেতে চায়।

... একজন অখণ্ড সৎ ব্যক্তির মধ্যে সবসময়ই সততার চর্চা রয়েছে, একারণে তার কাছে যে কেউ সত্য এবং সততার প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান হবে।.. . .. . . .

এক ও অনন্য হিসাবে প্রত্যেকটি সত্তা সংঘটিত হবার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে জগতকে দেখে থাকে। সে ভিন্নতার ভিত্তিতেই সে তার বিশ্বাস ও মতামত গড়ে তোলে। এজন্য সত্যকে লজ্ঞন করে, কিংবা ব্যক্তির হৃদয়ে মিথ্যার জন্ম দেওয়া, অসত্যের আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা — এসবই হলো ব্যক্তির বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করা। একজন ব্যক্তি সত্য অনুসন্ধানে ভুল করতে পারেন, কিন্তু তার নিজের জন্যই সেই অনুসন্ধানের কাজটি করতে হবে। অন্যদের দায়িত্ব হলো সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাকে দেখিয়ে দেওয়া কীভাবে তার অনুসন্ধানটি ভ্রান্ত। কেউ যদি প্রভাবিত হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে পরিত্যাগ করাই ভালো। গান্ধী মনে করেন কোনো একজন ব্যক্তির সাধুতা বা অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার শর্তই হলো তার জগতকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং সেসবের মধ্যে সত্যের প্রতিফলন ঘটানো। চাপ প্রয়োগ করে কোনোকিছু করা এবং প্ররোচনা এই দুইয়ের মধ্যে গান্ধী গুণগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। প্ররোচনা অন্য ব্যক্তির সামগ্রিকতার প্রতি মর্যাদা দেখায় এবং তাকে প্রভাবিত করে। জগতকে দেখার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীর দর্শনে ছিল।

গান্ধী যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা ‘একজনের কাছে প্রতীয়মান সত্য’, ‘কোনো একজনের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ’ এবং ‘নিজস্ব পদক্ষেপের’ সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝেছেন সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতাকে। একজন ব্যক্তির কোনোকিছু সম্পর্কে জানা বা গ্রহণ করার সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পৃক্ত। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি তার সীমাবদ্ধতাকে, সম্ভাবনাকে এবং পছন্দ তৈরী করার ধারাকে সনাক্ত করতে পারে। এখন আমার জীবন যাপনের পন্থা যদি কোনোকিছুকে ভালোবাসতে সাহায্য করে এবং আমি নিজে যদি এর উপাদান হয়ে যাই তাহলে বুঝতে হবে আমি আমার মুক্ত হবার বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত করিনি। এর কারণ হলো আমার নিজের দ্বারা এটি পছন্দ করা হয় নি। যদি আমি উপলব্ধি করতে পারি যে বিশেষ কোনো কামনাজাত শর্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তি সত্তার সংহতি হচ্ছে না এবং যদি সিদ্ধান্ত নেই একে তুষ্ট না করার জন্য তাহলে আমি বলতে পারব না যে বন্দী রয়েছি। এর কারণ হলো আমি আমার কামনাকে সংযত করেছি। অনেক উদারপন্থিগণ দাবি করেন স্বাধীনতা পছন্দের মাধ্যমে সংগঠিত হয় না । কিংবা ভাববাদীরা যেরকম মনে করেন পছন্দ নির্বাচন সর্বোচ্চ কোনোকিছুর উপর নির্ভর করে তাও ঠিক নয়।..

অনেক ভারতীয় দার্শনিকদের মতোই গান্ধী সত্যের অধীনে রেখে স্বাধীনতাকে উপস্থাপন করেছেন। একমাত্র মুক্ত স্বাধীন মানুষই তার এক ও অনন্য তত্ত্ববিদ্যক সত্যের সাহায্যে পছন্দ নির্বাচন করার সামর্থ্য অর্জন করে, কোনো কিছু আবিষ্কার করার সক্ষমতা, বিকশিত ও বেঁচে থাকতে পারে। আর এভাবেই স্বাধীনতা একজনের জন্য সত্য হয়ে উঠবার অপরিহার্য ভিত্তি ও পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করে। আর এটিকে অস্বীকার করার অর্থই হলো তার নিজেকে অসত্যবাদী হবার চাপ প্রয়োগ করা। গান্ধীর কাছে সত্য হলো সরল, একইভাবে স্বাধীনতাও তাই। আর এজন্য সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মানুষের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার নামান্তর। সত্যের প্রতি প্রেম অর্থই হলো তার অনুরাগীর প্রতি প্রেম প্রদর্শনের মতো। এজন্য জোর প্রয়োগ করে স্বাধীন হবার বিষয়টিকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না।

গান্ধী যখন স্বাধীনতার ধারণাকে পুনসংজ্ঞায়ন করেন তিনি মূলত সমতার ধারণাকে পুনসংজ্ঞায়ন করেন। অধিকাংশ উদারপন্থি এবং সমাজতাত্ত্বিক লেখায় ‘সমতা’ ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তুলনামূলক, চুক্তিভিত্তিক, প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে। পূর্বে আমরা লক্ষ করেছি গান্ধী মানুষকে মূল্যায়ন করেছেন অনিবার্যভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল সত্তা হিসাবে। এই বিবেচনা থেকে তিনি ‘সমতা’কে ব্যাখ্যা করেছেন।

গান্ধী নাগরিকত্বের ধারণারও পুনসংজ্ঞায়ন করেন। একজন রাজনীতিক কর্মী হিসাবে তিনি চিন্তা করেছেন কোনো ঐকমত্য, বা কোনো ইচ্ছা, কোনো ভয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না, রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো সহযোগিতা।[১] প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সেটা হোক গণতান্ত্রিক বা অন্য কোনোকিছু তা মূলত নির্ভর করে এর নাগরিকদেও সহযোগিতার উপর। সেটা নীরব কিংবা সরব, সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয়, ঐচ্ছিক কিংবা অনৈচ্ছিক যাহাই হোক না কেন। তবে এটাও ঠিক একটি রাষ্ট্র হলো কতগুলো কর্মকাণ্ডের আধার। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো হলো রাষ্ট্রের আদেশ মান্য করা, কর পরিশোধ করা, এবং রাষ্ট্রের আইন মান্য করা। নাগরিক ব্যতীত নৈর্ব্যক্তিকভাবে একটি রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল হতে পারে না। বস্তুত রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়াগত প্রাতিষ্ঠানিক আন্তসম্পর্ক। এটাও সত্য রাষ্ট্র হলো একটি বিশলায়তনের জটিল প্রতিষ্ঠান।

অনেক সরকারই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে থাকে। অনেকসময় দেখা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে খুব একটা উৎকৃষ্ট ভূমিকা পালন করে না। তবে এ দুটি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য হলো একটি যেখানে অনায়াসে হাল ছেড়ে দিতে পারে, অন্যটি (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা) তা পারে না। কারণ তাহলে এর নাগরিকগণ তাকে সহযোগিতা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় চেক ও ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যদি এর নাগরিকগণ উদাসীন, দুর্নীতি করার মনোবৃত্তি, ঠকবাজ এবং তাদের নৈতিক আচরণ হারিয়ে বসে তাহলে সে রাষ্ট্র যে কোনো মুহূর্তে খারাপ হয়ে যেতে পারে। গান্ধী মনে করেন একটি রাষ্ট্রের সদগুণ এবং অসদগুণ রাষ্ট্রের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় না। এসব উদ্ভূত হয় জনগণের মধ্য থেকে। যারা ধমক দিয়ে ভয় দেখায়, যেসব কীট অন্যদেরকে পদদলিত করবার জন্য

উৎসাহিত করে, নৈতিকভাবে দায়দায়িত্বহীন নাগরিক যারা স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাদেরকে গান্ধী ভীরু কাপুরুষ হিসাবে উল্লেখ করেন।

একজন নৈতিক নাগরিকের দায়িত্ব হলো কারা তার প্রতি সে আনুগত্য প্রকাশ করবে, কাকে সে সমর্থন করবে, কোন কোন শর্তের উপরে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। নাগরিকের আত্মসন্মানবোধ এবং মর্যাদাই নির্ধারণ করে তার আনুগত্য শর্তহীন হবে না, কিংবা অনুমোদন দেবার নিমিত্তে হবে না। যদি কোনো রাষ্ট্রের আইন ন্যায়সংগত হয় তাহলে নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য হলো এর প্রতি ইচ্ছাপ্রণোদিত স্বতস্ফূর্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হওয়া। কর্তব্যের একটি দ্বৈত-স্বরূপ রয়েছে। একজন নৈতিক সত্তা হিসাবে মানুষের কতগুলো সাধারণ কর্তব্য রয়েছে অথবা ভালো কোনোকছুিকে সমর্থন করার দায়িত্ব রয়েছে। আবার একজন নৈতিক নাগরিক হিসাবে তার গোষ্ঠীর প্রতি যেখানে সে জন্ম নিয়েছে কিংবা বেড়ে উঠেছে, যেখান থেকে সে লাভ পেয়েছে তার প্রতিও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। আবার কোনো আইন যদি নৈতিকভাবে গ্রহণের অযোগ্য হয় তাহলে তার উচিত সেসব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং অমান্য করা। কারণ কোনো অন্যায় আইন মান্য করার অর্থই হলো 'মন্দকর্মে অংশগ্রহণ করা'। সেটির অনৈতিক ফলাফলের দায়ভার নৈতিক কারণে তাকেই নিতে হবে।[১০] কোনো সমালোচনা ব্যতীত কোনো আইনকে মান্য করা একধরনের 'কুসংস্কার' এবং কৃতদাসের মনোবৃত্তি ধারণ করার সামিল। একজন নাগরিক হিসাবে সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য তাকেও সমভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে। নাগরিকত্ব কোনো স্বায়ত্তশাসিত বা অসংলগ্ন ভূমিকা নয়। বরং এটি হলো প্রকাশভঙ্গি এবং একজনের সামগ্রিকতা এবং মানবত্বের উপলব্ধি। কোনো মানুষ মানবতাকে ভুলুণ্ঠিত না করে সমালোচনাবিহীন এবং চরমভাবে রাষ্ট্রকে সমর্থন করতে পারে না।

ভিন্নভাবে বসবাস

এখানে আমি গান্ধীর জীবনের সীমিত কতগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া হয় নি। গান্ধীর চিন্তা অনেকটা যীশু এবং বৌদ্ধের জীবনদর্শনের মতোই জীবন যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিফলন তার কর্মেও লক্ষ করা যায়। তার চিন্তা শুধু গ্রন্থ এবং গবেষণা প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় নি, বরং তাঁর জীবন যাপনের ধারাও তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনই ছিল একটি মহাগ্রন্থ, এবং এ জীবনের মধ্যেই তাঁর লেখা ও চিন্তার খোড়াক লুক্কায়িত ছিল।

গান্ধীর জীবনের প্রথম ত্রিশ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন গৃহস্থ। এ পর্যায়ে তিনি সমাজের প্রতি, বিয়ে, শিশু জন্মদান এবং সামাজিক দায়বোধের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে তিনি সামজিক সংস্কারের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন, নিজের চিন্তাভাবনার আঙ্গিকে জীবনের রচনা লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। এর পরবর্তী সময়কাল থেকে তাঁর জীবনের কেন্দ্রীয় নৈতিক লক্ষ ছিল 'মোক্ষ' অর্জন। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের এই ধারণাটি তিনি তাঁর জীবনের বোধ উপলব্ধি এবং খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের আঙ্গিকে পুনসংজ্ঞায়ন করার প্রয়াস চালান। এই সংজ্ঞায়নে 'মোক্ষ' বলতে তিনি তিনটি ধারণাকে বুজিয়েছেন : প্রথমত, যৌনতাসহ সকল ইন্দ্রিয়ের উপর ব্যক্তির প্রভূত্ব বিস্তার, দ্বিতীয়ত, মনকে সকলপ্রকার ভয়, হিংসা, করুণা-দয়া, নীচুতা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা, এবং তৃতীয়ত, আত্মবাদীতার চুক্তি থেকে মুক্ত হওয়া, এতে করে সকল প্রাণজ-সত্তাকে 'বিশ্বজনীন প্রেমের' আওতায় নিয়ে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এবং এর লক্ষ্য হলো প্রত্যেকটি চোখ থেকে দুঃখের অশ্রু মুছে ফেলা। 'মোক্ষের' প্রথম দুটি সংজ্ঞা ব্যক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর তৃতীয়টি জীবনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গান্ধী এই তিনটি পর্যায়ের সঙ্গেই সংগ্রাম করেছেন। এসবের মূললক্ষ্য ছিল কীভাবে বিশুদ্ধ এবং সুন্দর আত্মার অধিকারী হওয়া যায়। আপাতত এই সংগ্রামের মধ্যে প্রচণ্ডতা চিল, অপসহীনতা ছিল এবং সংশয় ও হতাশা ছিল। কিন্তু এ সংগ্রামের পরিণতি ছিল নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রভাবিত জীবন অর্জন করা।

তার উল্লেখযোগ্য জীবনের বেশকিছু ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে। তার বন্দী জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি লক্ষ করেছেন কৃষাঙ্গ প্রহরীদের বিষাক্ত প্রাণী বা বিছা দিয়ে আঘাত করা হতো। তাদের চিৎকার শুনতে পেলে তাৎক্ষণিকই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেন। ডাক্তার ডাকতেন। ডাক্তার আসা পর্যন্ত চুষে দূষিত রক্ত বের কওে ফেলতেন। নিজের জীবনের কথা না ভেবে কিংবা নিজের

ক্ষতি হতে পারে তা না ভেবেই তিনি তা করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ্যবোধ না করত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি রক্ত চুষে দিতেন। আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ্যবোধ করলেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করতেন।[১২]

ইন্দুলাল ইয়াজনিক, গান্ধীর এক সময়কালের সহকর্মী গান্ধীর বিপক্ষে অবস্থান নেন। গান্ধীর বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে বেশ আক্রমণ করতেন। একসময় তিনি আবার এসব অস্বীকার করে গান্ধীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এ ছিল গান্ধীর এক নীরবতার দিন। একদিন তিনি অনেক দর্শনার্থির সঙ্গে ইয়াজনিককে দেখতে পান, কিন্তু তাকে কিছুই না বলে মৃদু হাসিতে সাদর সম্ভাষণ জানান। তারপর তাড়াহুড়ো করে হিজিবিজি লেখাসহ একটি কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দেখতে বলেন। একসময় ইয়াজনিক এই কাজটিই করতেন। গান্ধীর এই ব্যবহারে ইয়াজনিক হতবম্ভ হয়ে কেঁদে ফেলেন।[১৩]

কংগ্রেসের একসময়কালের সভাপতি মওলানা আজাদ গান্ধীর পরামর্শ ব্যতীত, এবং গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেসময় ভারতে সফররত বৃটিশ মন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কাছে যান। গোপন সূত্র থেকে জানা যায় মওলানা আজাদ মন্ত্রীকে ভারত বিভক্তির পক্ষে তার এবং কংগ্রেসের মতামত রয়েছে বলে জানান। এ সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসের সভার একটি নোটও দেন। কিন্তু ক্রিপস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিস্মিত হয়ে জানতে পারেন গান্ধী এসবের কিছুই জানেন না। পরে তিনি মামুলি হাস্যলাপ করে ফিরে যান। পরের দিন যখন আজাদ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন গান্ধী তাঁকে জিজ্ঞাস করেন ক্রিপসের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা। আজাদ অস্বীকার করেন। গান্ধী নিশ্চুপ ছিলেন। অথচ সেইসময় ক্রিপসকে দেওয়া আজাদের সেই নোটটি তখনও গান্ধীর ডেস্কেই ছিল। মওলানার সেই স্থল ত্যাগ করার পর গান্ধীর ব্যক্তিগত সহকারী তাঁতে পরামর্শ দেন নোটটির অনুলিপি করে রেখে দেওয়ার জন্য যা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে। গান্ধী তার এই প্রস্তাব খণ্ডন করেন এবং তাঁকে বলেন এর মূলকপিটি ক্রিপসকে ফেরত দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ব্যক্তিগত সহকারীকে মওলানা আজাদের উপর বিশ্বাস হারানোর জন্য ধিক্কার দেন।

১৯৪৭ সালে কোনো একদিনের প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরিত হয়। লোকজন ছুটাছুটি করে দিকবিদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। গান্ধী তাদেরকে নিবৃত করে প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকেন। গান্ধীকে তাঁর কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত করা অথবা প্রতিরোধ কর্মকাণ্ড ন্যুনতম করার জন্য ভারত সরকার পরামর্শ দিয়েছিল। এ ধরনের পরামর্শ গান্ধী প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তা পরামর্শ করেছিল যা তাঁর অহিংস প্রতিশ্রুতির প্রতি আপসেরই সামিল হতো। একারণেই উভয়ই তাঁর কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

ভারত যখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে, তখনই সেখানে ধর্মীয় হিংসা মাথাচারা দিয়ে উঠে। সারা জীবন গান্ধীকে গভীর দুঃখময়তার মধ্যে থাকতে হয়েছে। তারপরও তিনি কোনোপ্রকার পরাজয় বা হতাশার কথা না ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এককভাবে হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ কোনোপ্রকার শারীরিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করেই দুর্গম এলাকায় আন্তসম্প্রদায়গত শান্তির জন্য কাজ কওে গিয়েছেন। হয়তো আমার ধারণা ভূল হতে পারে তবুও আমি মনে করি গান্ধী যদি নিজের উপর যে সহিংসা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখিয়েছেন তা যদি অপসারণ করতে পারতেন তবে তিনি সামাজিক হিংসার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন। তিনি যে তাঁর উলঙ্গ নারী সহকর্মীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে নিজের পবিত্রতা বজায় রেখে বিশুদ্ধতা অর্জন করার ডানপিটে পরীক্ষা চালিয়েছেন তাও তার প্রতি সহিংসতারই প্রকাশ।[১৪] তার সহকর্মীদের নানাধরনের আক্রমণ ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তিনি তাঁর মুখ বন্ধ রেখেছিলেন। এর কারণ হলো এসব অনসুরারাই তাঁকে মহাত্মার আসনে বসিয়েছেন। তাঁর কাছে অনুসারীদের যে প্রত্যাশা তা নিয়ে কখনোই তিনি ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিল একান্তই তার মতো যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কখনো মনে হতো তিনি তাঁর মহাত্মা পদবী হারিয়ে ফেলছেন তাতে তিনি এক বিশাল বোঝামুক্ত হবার আনন্দ পেতেন। আবার তাঁর কোনো কাজ যদি সাধারণ মানুষের সমালোচনার বিষয় হতো তা তিনি সাহসের সঙ্গে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতেন। স্বাধীন নৈতিক চেতনার প্রশ্নে গান্ধীর মতো অপসহীন ব্যক্তি সমাজে বিরল। প্রথাগত ভারতের জন্য গান্ধী ছিলেন ভিন্নমত ও ঔদ্ধত্যের প্রতীক।

গান্ধীর কোন ধারণাটি স্থায়ী মূল্য হিসাবে বিবেচতি হওয়া উচিত তা বলা কঠিন। তবে তাঁর সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি যে আপসহীন প্রতিশ্রুতি, সংগতি ও সামগ্রিকতার প্রতি দৃঢ় অনুসন্ধিৎসা, সামগ্রিক ভয়হীন ব্যক্তিত্ব, মানব অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অনুসন্ধান করার নিরলস প্রচেষ্টা — এসবই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থায়ী অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৩৭ সালে তিনি বলেন : আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখনীও শবদাহ হবে। আমি যা কিছু করেছি তাই টিকে থাকবে, কিন্তু আমি যা কিছু বলেছিজ বা লিখেছি তা সেভাবে টিকে থাকবে না।" এভাবে তাঁর জীবন আমাদের কাছে এক মহৎ দলিল। আর তাই আমাদের কাছে গান্ধীর জীবন হল এক সতর্কিত কারুকাজ খচিত পাঠ। আর এজন্যই তাঁর চিন্তা স্থায়ী হয়ে থাকবে দলিল হিসাবে।

নোট্স

১. See my ` Einstein Assesment of Gandhi', The Round Table, 1991.

২. 'Gandhi : the other side of the balance sheet' in Krolik and Cannon, eds., *Gandhi in the Postmodern Age*, (Golden, Colarado : Colarado School of Mines Press, 1984), p.15.

৩. From Yeravada Mandir, (Ahmedabad: Navajivan, 1932) ch.s 1-5.

৪. *Collected Works*, vol. 50, p.218; Raghavan Iyer, *The Moral and political Writtings Mahatama Gandhi* (Oxford: Clarendon Press, 1986) Vol. 11, pp.552f.

৫. *Young India*, 4 December 1924.

৬. Raghvan Iyer, Op.cit., Vol.2 , see VII.

৭. ibid. pp.298ff.

৮. Harijan, 2 June 1946; see also preface to his *The Story of My Experiments with Truth* (Ahmedabad: Navajiban, 1956) and *Collected Works*, vol. 50, p.216. I have discussed this more fully in my Gandhi's Political Philsophy, op.cit., pp.92 f. As Shamkara put it, the real nature or disposition of a thing constituted its truth (Tasya bhavah tattvam). *The Gita*, ch.18, verse 47, talks of swabhavaniyatam karma, that is, duties that are consonant with the individual's psychological and moral constitution.

৯. Raghavan Iyer, op.cit., Vol.11 p.355.

১০. Young India, 22 July 1920.

১১. *Young India*, 1 December 1920, 1 June 1921 and 5 January 1922; see also *Hind Swaraj*, op.cit., pp.80 f.

১২. Indulal K. Yajnik, *Gandhi As I Know Him* (Delhi : Danish Mahal, 1943) p.303.

১৩. For this and the following incidents, see Pyarelal, *Mhatma Gandhi :The Last Phase*, two vols. (Ahmedabad : Navajivan, 1956).

১৪. Ibid., vol. 1, bk.2, ch xi.